এক

ন্যানো নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর

'ন্যানো' মোটর গাড়ির কারখানা সিঙ্গুর থেকে গুজরাটে চলে গেল। চলে যাবার সংবাদ দিতে শ্রী রতন টাটা সুদূর জার্মানী থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। তারপর একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে চলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে এই রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবে তিনি কারখানার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জন্য তাকে চলে যেতে হচ্ছে। এখানে কিছু মানুষ তাকে চাইছে না। একজন 'আন-ওয়ানটেড করপোরেট সিটিজেন' হিসেবে তিনি এখানে থাকতে চান না। তাই বুকভরা বেদনা নিয়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে।

উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরেও তিনি আন-ওয়ানটেড ছিলেন। সেখানেও তার স্টীল প্লান্টের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছিল। মানুষের প্রতিরোধ ভাঙ্গতে পুলিশ চোদ্দজন গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে সেখানে। এর পরেও তিনি সেখানে আন-ওয়ানটেড বোধ করেন নি! সেখান থেকে চলে যান নি।

নিছক আন্দোলনের কারণে একজন ব্যবসায়ী জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। করপোরেট ডিসিসন এভাবে হয় না। এ ধরনের আন্দোলন করপোরেট ওয়ার্লডের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এসব ফালতু ঝামেলা। ব্যবসা করতে গেলে এমন দু'একটা ঝামেলা ফেস করতেই হয়। এমনটাই মনে করে তারা। ফলে সিঙ্গুর থেকে টাটা'র পাট গুটিয়ে নেওয়ার ডিসিসন আন্দোলনের কারণে হয়েছে এমনটা নাও হতে পারে। এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কারণ কিছু আছে। সেটা এখুনি জানা যাচ্ছে না। কোনো দিন হয়তো জানা যাবে।

অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ দেশ থেকে দেশে আছড়ে পড়ছে। তাতে অনেক কিছুর সাথে গাড়ির বাজারেও মন্দা দেখা দেবে সেটা আমরা না বুঝলেও ব্যবসা জগতের চাঁই-রা জানতেন। আশঙ্কা অবশেষে সত্যি হয়েছে। দুনিয়াজুড়ে গাড়ির বাজারে ধ্বস নেমেছে। সর্বত্র অবিক্রিত গাড়ির পাহাড় জমে উঠছে। ফোর্ড সহ অনেক কোম্পানীই বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করেছে। টাটা কোম্পানীর টেলকো কারখানাও মাঝে মধ্যে বন্ধ থাকবে বলে নোটিশ জারি হয়েছে।

পুরনো নামি-দামি কোম্পানীর গাড়িরই এই হাল। সেখানে নতুন গাড়ি নিয়ে বাজারে নামলে কি হাল হতে পারে সহজেই অনুমেয়। ফলে ন্যানো নিয়ে এক্ষুণি বাজারে না নামাই উচিত বলে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকতে পারে। পেছিয়ে যাবার জন্য একটা যুৎসই অজুহাত হাতের কাছে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে গন্ডগোল। জমি নিয়ে আন্দোলন মিটছে না। তাই গাড়ি বার করা গেল না। ন্যানো গুজরাট থেকে বেরবে। এজন্য একটু সময় তো লাগবেই। সবাই বুঝবে কথাটা।

তবে এত দিনে শ্রী রতন টাটা বোধহয় ন্যানোর কথা ভুলেই গেছেন। কারণ ইতিমধ্যে আরও বড় বিপদ উপস্থিত তার সামনে। বিলেতে তাদের সদ্য অধিগৃহীত ল্যান্ড রোভার-জাগুয়ার কারখানায়ও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই মন্দার বাজারে কে কিনবে ওই দামি গাড়ি? গাড়ির ডিলাররা তাদের লোকজনদের ছুটি দিয়ে শোরুমের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। জাগুয়ার বাঁচানর জন্য বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন টাটা। এক বিলিয়ন পাউন্ড অনুদান চাই। তা না হলে কর্মী ছাঁটাই হবে বলে দিয়েছেন। ফলে এই অবস্থায় টাটার ন্যানো নিয়ে ভাবার অবসর থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলা বাজারে ন্যানো নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর চলছেই।

র. চ.

দুই

মন্দাক্রান্তা যান-বাজার

গাড়ির উৎপাদন কমেছে এদেশেও। কী কারণে কমেছে তার ব্যাখ্যা এক এক মহলে এক এক ভাবে করা হচ্ছে, আমরা শুধু পরিসংখ্যানটা তুলে ধরছি।

পশ্চিমের দেশগুলোর গাড়ির বাজার বেশ কয়েক বছর ধরেই খারাপ। ভারত সহ পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশকে অটোমোবাইল শিল্প ও প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় বাজার হিসাবে ভেবেছিলেন অর্থনীতির পন্ডিতরা। আপাতত তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। টাটা ,ফোর্ড, জি এম, স্কোডা ইন্ডিয়া -সব গাড়ি উৎপাদক কোম্পানিই গাড়ির দাম কমিয়েছে, অবস্থা সামাল দিতে। কিন্তু বাজার বাড়ছে না বরং কমছে। গত বছর নভেম্বর মাসের (২০০৭) সঙ্গে এ বছরের নভেম্বর মাসের (২০০৮) তুলনা করে সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স বা 'সিয়াম' এই হতাশাজনক হিসাব তুলে ধরেছে। সিয়াম-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আভ্যন্তরীন বাজারে (ব্যক্তি মালিকানায়) গাড়ির বিক্রি কমেছে ১৭.৯৮ শতাংশ। বানিজ্যিক বাজারে (প্রতিষ্ঠান / সংস্থায়) বিক্রি কমেছে ৪৯.৫২ শতাংশ, যাত্রিবাহী গাড়ির বিক্রি হ্রাস পেয়েছে ১৯.৩৮ শতাংশ। দু'চাকার মোটর গাড়ির বিক্রি পড়েছে ১৪.৬৮ শতাংশ।

ভারতের গাড়ি ব্যবসার বাদশা, মারুতি-সুজুকির গাড়ি বিক্রি কমেছে ২৪.৮৪ শতাংশ, হায়উন্দাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেডের কমেছে ২৩.৩২ শতাংশ। কিন্তু মজার তথ্য হলো, ন্যানোর গোলমালের মধ্যেও টাটা মোটরর্স -এর গাড়ি বিক্রি সামান্য হলেও বেড়েছে। **শ.ন.**

তিন

সন্ত্রাস এবং ব্যবসা

গুটিকয়েক ছোকরা কিছু অস্ত্রসস্ত্র আর গোলা বারুদ নিয়ে মুম্বাই রেল স্টেশনে, একটি বাড়িতে এবং গোটা তিনেক হোটেলে কি খেলটাই না দেখাল। টিভি চ্যানেলের অবিরাম প্রচারের দৌলতে তিন দিন ধরে পুলিশ, মিলিটারি, অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড, স্পেশাল সিকিউরিটি গার্ড, ব্ল্যাক-ক্যাট, নেভাল-কমান্ডো-দের ছোটাছুটি ওড়া-উড়ির বিশদ বিরল দৃশ্য দেখা গেল। দুনিয়াজুড়ে সবাই দেখল। শুনতে পাই সাত তারা হোটেলে সিকিউরিটি বন্দোবস্ত নাকি এমন টাইট যে সেখান দিয়ে ছুঁচও গলতে পারে না। সেখান দিয়ে এত এত অস্ত্রসস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে ঢুকে পড়ল লোক! গার্ডরা কি ওগুলো আলুর বস্তা ভেবে গেটে ছেড়ে দিয়েছিল?

খবরে জানা গেছে এক একটি হোটেলের দখল নিয়েছিল সাকুল্যে দুই কি তিন জনের দল। এই ক'জনেই কত কি করল! কত দিক সামলালো! হোটেলের চার পাঁচ'শ কামরার লোকজন ও হোটেলের শতখানেক কর্মচারিদের মেরে ধরে সায়েস্তা করল, বাইরের শত শত পুলিশ ও কমান্ডোদের ঠেকিয়ে রাখলো, হোটেলের নানান ফ্লোরে ঘুরে বেরালো, কখনো ওপর তলায় কখনো নীচের তলার ঘরে আগুন লাগালো কি গ্রেনেড ফাটাল। এরই মধ্যে সময় করে খাওয়া-দাওয়াও সারলো। ওদের সঙ্গেই নাকি ড্রাই ফুড প্যাক ছিল। এত কিছু করলো মাত্র দুই কি তিনটি লোক!

এই দু'তিন জনকে কব্জা করতে আমাদের হরেক নামের কমান্ডো বাহিনীর লাগল প্রায় তিন দিন। এরই মধ্যে প্রাণ হারাল শত খানেক লোক। যার মধ্যে কয়েকজন কমান্ডো বাহিনীর অফিসারও আছে। আসলে দেশের নেতা আর মন্ত্রীদের পাহারা দিতে দিতেই এদের দফা রফা। পাহারা মানে তো সেজেগুজে হাতে একটা রাইফেল নিয়ে নেতাদের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ানো। আর কাজ মানে রাস্তার ধারের লোকেদের চমক দেখানো। গোটা-টাই একটা সার্কাস। এর পরেও এদের পক্ষে মোটিভেটেড জেহাদিদের মোকাবিলা করা সত্যিই শক্ত। ফলে যা হবার

তাই হয়েছে।

কিন্তু বিপদ হয়েছে এই ঘটনার পর দেশজুড়ে আওয়াজ উঠেছে আমাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা নাকি বড়ই পলকা। একে ঢেলে সাজাতে হবে। মানে সিকিউরিটি বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। এবং এদের আরও ইকিউপ করতে হবে। এখনই সব মিলিয়ে এসব বাহিনীতে লোকের সংখ্যা ৪৫০০০। এর পেছনে বছরে খরচ ৮২৫,০০,০০,০০০ টাকা! এবারের হুজুগে নতুন দিক হল শুধু বর্ডার এলাকা নয়, দেশের গোটা সমুদ্রোপকূল ধরে পাহারাদারী বাড়াতে হবে। এজন্য চাই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। মানে আধুনিক সিকিউরিটি ইকিউপমেন্ট। যা খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার। কিন্তু দুনিয়াজুড়ে এই যন্ত্রপাতির কারবারের রমরমা বাজার এখন।

সব দেশের নেতারাই হঠাৎ একযোগে বলতে শুরু করেছেন যে মানবজাতির সামনে আজ সব থেকে বড় সমস্যা হল সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের মোকাবিলার জন্য নানান বন্দোবস্তের সাথে ইলেকট্রনিক সারভিলিয়েন্সের যন্ত্রপাতি বসানোও খুব জরুরি। মুম্বাই হামলার পর দিল্লীতে মন্ত্রী এবং সিকিউরিটি কর্তাদের যে হারে মিটিং হচ্ছে তাতে বোঝাই যায় অচিরেই হাজার হাজার কোটি টাকার সিকিউরিটি যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হবে।

সব ব্যবসাতেই চাহিদা তৈরির জন্য একটা বিজ্ঞাপনের ব্যাপার আছে। সন্ত্রাসবাদীদের হামলার টিভি শোগুলোকে সিকিউরিটি ইকিউপমেন্টের চাহিদা তৈরির লাইভ বিজ্ঞাপন হিসেবে ধরা যেতে পারে। আনুমান করা হচ্ছে যে মুম্বাই-কান্ড ঘটানর জন্য সন্ত্রাসবাদীদের দশ কোটি টাকার মত খরচ হয়েছে। হাজার কোটি টাকার সিকিউরিটি ইকিউপমেন্টের ব্যবসার জন্য দশ কোটি টাকা মোটেই বেশি খরচ নয়। কারণ এই বিজ্ঞাপনই যদি মুম্বাইর চিত্রতারকাদের দিয়ে করাতে হতো তা হলে এর থেকে ঢের বেশি খরচ পড়তো। তার ওপর সেসব বিজ্ঞাপন অন্যান্য শো-এর ফাঁকে ফাঁকে খামচা খামচা করে দেখান হত। সন্ত্রসবাদী হামলার শোয়ের মত এমন আন-ইন্টারাপটেড শো হতে পারতো না। ফলে সব দিক বিচারে এটাই মোস্ট এফেকটিভ এবং ইকনমিক ওয়ে অফ অ্যাডভার্টাইজিং হয়েছে। এমন কি হতে পারে না সিকিউরিটি ইকিউপমেন্টের কারবারিরাই সন্ত্রাসবাদীদের স্পন্সরার?

র. চ. চার

মুম্বাই কান্ড ও প্রো-অ্যাকটিভ মিডিয়া

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের অ্যাঙ্কার-পারসন, রিপোর্টার ও ক্যামেরা-পারসনরা যেভাবে দিন নেই রাত নেই মুম্বাই-এর জঙ্গী হামলার খবর প্রচার করলেন তা এক কথায় অনবদ্য। অজস্র টিভি চ্যানেল জড়ো হয়েছিল সেখানে। সবাইকেই সবার আগে খবর ছাড়তে হচ্ছিল। সে এক ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা। সবার খবরই প্রথম। সব্বাই বলছে আমরাই প্রথম এ খবর দিচ্ছি!

শুধু খবর নয়, এরই ফাঁকে ফাঁকে চলছিল জনমত গঠনের কাজ। এসবের জন্য কে বা কারা দায়ী খোঁজা চলছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধরে ধরে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছিল। পথ চলতি মানুষজনদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। অবাক কান্ড, দেখা গেল ব্যতিক্রমহীনভাবে সবাই পলিটিসিয়ানদের মুন্ডুপাত করছেন! সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। কি তেজোস্বী ভঙ্গী ও ভাষা সবার! তাজ চত্বরেই পথচারি এক মহিলাকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে বলা হল। মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরতেই মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন পলিটিসিয়ানদের ধরে ধরে খুন (কিল) করা দরকার!

রাজনৈতিক নেতারা সব ব্যাপারেই মতামত দিয়ে থাকেন। এইবার দেখা গেল তারা প্রায় চুপচাপ। একটু ভড়কে গিয়েছিলেন বোধহয়। হাওয়া খারাপ বুঝে মুখ না খোলাই ভাল বিবেচনা করেছিলেন। একজন ব্যতিক্রমী আছেন দেখা গেল। বিজেপি’র একজন নেতাকে মুখ

খুলতে দেখা গেল। সাধারণ মানুষের এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে ওনার কি বলার আছে জানতে চাওয়া হলে উনি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠেন যে ঠোঁটে লিপস্টিক-মাখা মহিলারা কি বলল তাতে তার কিছু যায় আসে না! অর্থাৎ তিনি নিশ্চিত যে কপালে তিলক-কাটা বজরঙ দলের সদস্যরা যতক্ষণ তার সহায় আছে ততক্ষণ ভাবনার কিছু নেই। র. চ.

পাঁচ

উপকূল বাঁচাও

ভারতের শতকরা ২৫ জন মানুষের বাস উপকূলের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে। শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য হোটেল রিসর্ট, মাছের ও চিংড়ির ভেড়ি বেড়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে, জনবসতির ঘনত্ব বেড়েই চলেছে। এবং এসবই ঘটছে, ঘটে চলেছে উপকূল রক্ষার আইন থাকা সত্বেও।

পরিবেশ আইন, ১৯৮৬'র অধীনে বন ও পরিবেশ দপ্তর উপকূল রক্ষার উদ্দেশ্যে আইনী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল - পোষাকী নাম ছিল - উপকূল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি (Coastal Regulation Zone Notification। তাতে অন্তত জাতীয়ভাবে উপকূল সুরক্ষায় সদিচ্ছার ছাপ স্পষ্ট ছিল।

কিন্তু ভারতে যেমনটা সাধারণত হয়েই থাকে - আইন হলেও তার রূপায়ণে কর্তারা আন্তরিক থাকেন না - এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না। একের পর এক আইন লঙঘনের ঘটনা ঘটেই চললো, বাধা দেওয়ার বদলে সেগুলি থেকে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে তোলা আদায় চলতেই থাকলো। দীঘার কাছে মান্দারমনি কলকাতা ও অন্যত্র বড় বড় হোর্ডিং-এ পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানায়। কজনই বা জানে যে সম্পূর্ণ বেআইনী এই রিসর্ট, কাদের প্রশ্রয়ে কিভাবে গড়ে উঠলো একেবারে সমুদ্র-সৈকতের কোল ঘেঁসে? মামলা চলছে - হাইকোর্টে। সে চলুক, চলুন বেরিয়ে আসি! এমন ঘটনা দেশ জুড়ে শত শত। রাজনীতির কেষ্টবিষ্টুদেরও অনেকে জড়িত এসব ব্যবসায়।

ইতিমধ্যে আইনী বিজ্ঞপ্তি - সি আর জেড নোটিফিকেশনের সংশোধন ঘটতেই থাকে। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ এর ১৭ বছরে ২১ বার সংশোধিত হয়ে, এখন এসেছে সি এম জেড নোটিফিকেশন (CMZ Notification বা Coastal Management Zone Notification। নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বা Regulation Zone পরিবর্তিত অভিধায় ব্যবস্থাপনা অঞ্চল বা Management Zone হয়ে যেতে চায়। রূপও বদলাবে, এলাকা নতুন ভাবে চিহ্নিত হবে, ব্যবসা-কারবার যেসব এলাকায় নিষিদ্ধ ছিল, সেসব এলাকায় নিয়ন্ত্রিত কারবারের ছাড় থাকবে। বেসরকারী মালিক থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সবাই আশায়। পুরনো বেআইনী কাজকারবারগুলি এবার আইনী বৈধতা পেয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন প্রবল আশায়, নতুন উদ্যমে নয়াচরে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী। CRZ- এর কবলে থাকলে যে অসুবিধা ছিল, CMZ-এ সে অসুবিধা আর থাকবে না, মাভৈঃ।

১৯৯১-এর বিজ্ঞপ্তিতে সুরটা ছিল- স্পর্শকাতর এবং প্রচন্ড উৎপাদনশীল ইকোসিস্টেম হিসেবে উপকূল সংরক্ষণের। তার পর প্রতিটি সংশোধনীতে সে সুর নরম করা হয়েছে। CMZ বিজ্ঞপ্তি সেসবের পরিণতি। রাজ্যে রাজ্যে একটি করে ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (ICZMA থাকবে, তারাই 'ব্যবস্থাপনার' পরিকল্পনা ও দেখভালের দায়িত্বে থাকবে। এরাজ্যেও একটি ICZMA আছে, নয়াচরের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তারা উদার।

বিশ্বজুড়ে আজ আওয়াজ উঠেছে ইকোসিস্টেমের যথাযথ সুরক্ষার জন্য স্থানীয় চিরাচরিত অধিবাসী যারা, যাদের জীবন-জীবিকা সংস্কৃতি প্রকৃতির তালে ছন্দে সুঠাম সম্পর্কে সংপৃক্ত তাদের অধিকার স্বীকার করে, উন্নয়ন - ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশীদারিত্ব-কে প্রাধান্য দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপায়ণের পথে এগোতে হবে। এমত ভাবনার সূত্রেই আজ ভারতেও বনবাসীরা কিছুটা হলেও আইনী অধিকার লাভ করেছেন। নতুন অরণ্য ব্যবস্থাপনায় তাদের অধিকার কিছুটা

স্বীকৃত হয়েছে, যদিও তার রূপায়ণের পথে এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে, কিন্তু আইনী স্বীকৃতিটুকুতো তার প্রথম ধাপ। আশ্চর্যের বিষয়, ২০০৫-এর অরণ্য- বিষয়ক আইনের যে নীতির পক্ষে ছিল কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক, ২০০৮ CMZ এর বিজ্ঞপ্তিতে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা গেল না। CMZ বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের প্রায় ৭৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল বরাবর বিভিন্ন ভাষাভাষী মৎস্যজীবি সম্প্রদায় - দরিদ্র এবং চিরাচরিত সেসব গোষ্ঠীর প্রায় সওয়া কোটি মানুষ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হলেন। CMZ বিজ্ঞপ্তি বিষয়ে জনসাধারণের বক্তব্য জানার জন্য তাই ইংরেজী ও হিন্দী ছাড়া অন্য ভাষার স্থান নেই। যারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছেন, তাদের আইন বিষয়টা জানানোরও কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেই। রাজ্যে রাজ্যে তাই প্রথাগত মৎস্যজীবির সম্প্রদায় ভীত সন্ত্রস্ত, আন্দোলিত। তাঁরা আন্দোলন করছেন। কয়েকবছর আগের ভয়াবহ সুনামির জন্য বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছিলেন - উপকূলের প্রাকৃতিক সুরক্ষা বলয় - যেমন লবনাম্বু অরন্য (Mangrove forest ইত্যাদির ধ্বংস যদি অব্যাহত থাকে, তবে আরও ভয়াবহ সুনামির কালগ্রাস থেকে বাঁচবে না পৃথিবী। কিন্তু আমরা যেন উল্টোপথেই হাঁটতে চাই - সুনামির থাবায় উচ্ছিন্ন মৎস্যজীবিদের আর উপকূলের কাছাকাছি ঘেঁসতে দেওয়া হচ্ছে না। তারা বিপন্ন। নাগরিক সমাজের চুপ করে থাকাটা এখানেও মৃত্যুকে ডেকে আনার সামিল। জমি, জঙ্গল, জল, উপকূল, আকাশ - সর্বত্র পুঁজির কর্মকান্ডের একাধিপত্য বিস্তার - প্রাকৃতিক ও প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা মানুষ সহ সমস্ত জীবকূলের সংহার কোন ভবিতব্যের ইঙ্গিত? তাই নাগরিক সমাজেরও সোচ্চার হওয়া খুবই প্রয়োজন। ভেবে দেখুন, ভারতীয় উপকূলবাসী মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি কিনা

- মাছ ও জীববৈচিত্রের আঁতুরঘর উপকূল বাঁচাও।
- মৎস্যজীবি ও অন্যান্য স্থানীয় প্রথাগত অধিবাসীদের অধিকার স্বীকার করো।
- CMZ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করো।
- ম্যানেজমেন্টের টেকনিক্যাল কচকচিকে প্রধান্য না দিয়ে ১৯৯১-এর সুরে উপকূল সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করো।
- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে উপেক্ষা কোরো না, উপকূল রক্ষায় পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরী করো। **র. ম.**

ছয়

নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের গল্প ঃ

২০০৮ নিউক্লিয়ার শক্তির ফেরিওয়ালাদের পক্ষে কালা সাল হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। নভেম্বর ৯, ২০০৮ - এ প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে রাশিয়ার একটি নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত সাবমেরিনে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই ২০ জন মৃত্যুবরণ করে - আরও ২২ জন মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এঁদের বেশির ভাগেরেই অবস্থা সংকট জনক - যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের কারিকুরিতে তাঁরা এযাত্রায় বেঁচেও যান তবে তেজস্ক্রিয়তার জন্য তাঁদের ক্যানসারে মৃত্যু প্রায় ভবিতব্য।

নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির দিন দিন সুরক্ষাবৃদ্ধির যে গল্পকথা আমরা প্রতিটি দুর্ঘটনার পর শুনছি - এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাশিয়ার বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঘটনা সামান্য - দৈবাৎ ঘটে গেছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কমিটি শেষ পর্যন্ত মূল বিষয়টিকে জনসমক্ষে এনেছে। একটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, যেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হওয়া উচিত ছিল, তা চালু হয়নি। নেরপা নামক এই সাবমেরিনটি আকুনা-দুই প্রজন্মের সাবমেরিন - এবং বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী আক্রমণাত্নক সাবমেরিন। এহেন একটি সাবমেরিন অগ্নিকান্ডের ফলে (মনে রাখতে হবে এই অগ্নিকান্ড ঘটেছে জলের তলায় ডুবোজাহাজটির সামনের দিকটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে - এতটাই যে তাকে সেনাবাহিনীর একটি অস্থায়ী বন্দরে এনে সারাই-এর কাজ করতে হয়েছে। যথারীতি শোনা যাচ্ছে যে নিউক্লিয়ার চুল্লির কোনো ক্ষতি হয়নি - কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা কতটা নির্গত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো তথ্যই প্রকাশিত হয়নি।

রাশিয়ার সাবমেরিন সংক্রান্ত দুর্ঘটনার ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারীর ২৬ -এ এই

একই অস্কার – দুই প্রজন্মের একটি রাশিয়ান সাবমেরিনের নিউক্লিয়ার চুল্লির শীতল করার ব্যবস্থায় গোলোযোগের ফলে গ্যাসীয় শীতকবাহী একটি নল ফেটে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়। ৫জন অতি সিনিয়র অফিসার শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হন – এর মধ্যে ক্যাপ্টেনে পদমর্যদার একজন অ্যামোনিয়া বিষক্রিযায় মারা যান।

২০০০ সালের ১১ই আগষ্ট (সম্ভবত রাতভোরে রাশিয়ার কুরস্ক সাবমেরিনটি, রাশিয়ার মুরমানস্ক বন্দর থেকে ১০০ কিমি দূরে ডুবে যায়। ১৫ই আগষ্ট জানা যায় যে কুরস্ক সাবমেরিনটির যেখানে টর্পেডো রাখা ছিলো, সেই প্রকোষ্ঠে ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য সাবমেরিনটি ডুবে গেছে। বন্দরে ফিরছিলো বলে কুরস্ক তার নিউক্লিয়ার অস্ত্রগুলো অন্য একটি সাবমেরিনে চালান করেছিল। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে কুরস্ক সাবমেরিনটির দুটি নিউক্লিয়ার চুল্লির গুরুতর ক্ষতি হয়েছে – এবং সম্ভবত তা তেজস্ক্রিয় বস্তু সমুদ্রে ছড়াচ্ছে। আজ পর্যন্ত এই ডুবে থাকা সাবমেরিন থেকে তেজস্ক্রিয় বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১১৮ জনের প্রত্যেকেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। পুরো বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় কারণ রাশিয়া এই উদ্ধারকার্যে নরওয়ে এবং শেষ পর্যন্ত ন্যাটো-গোষ্ঠির সাহায্য প্রার্থনা করে। রাশিয়া যে নিজের থেকে উদ্ধারকাজ চালাতে পারেনি তার কারণ হলো উদ্ধার কাজের জন্য রাশিয়ার যে সমস্ত সাবমেরিন ছিলো, আর্থিক দিক থেকে বাহুল্য মনে হওয়ায় রাশিয়া আর সেগুলোকে ব্যবহার করছে না। এমন কয়েকটা অব্যবহৃত নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত সাবমেরিন রাশিয়া সম্প্রতি ভারতকে বিক্রি করেছে – ভারত -মার্কিন দ্বিপাক্ষিক পরমানু চুক্তির ফলে। কেননা রাশিয়া নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপের সদস্য হওয়ায়, এবং আই এইএ ভারতকে ছাড় দেওয়ায় ভারতের সঙ্গে এসব বেচাকেনার ওপর আর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

রাশিয়ার নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন বা নিউক্লিয়ার শক্তি পরিচালিত বস্তুর ডাস্টবিন হয়ে উঠেছে ভারত। চের্নোবিলে যে প্রজন্মের নিউক্লিয়ার চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিলো – ভারত সেই প্রজন্মের নিউক্লিয়ার চুল্লি বসাচ্ছে কোদানকুলমে। রাশিয়ার তামাদি হয়ে যাওয়া, বাতিল, দুর্ঘটনা প্রবণ সাবমেরিন এখন ভারতকে বিক্রি করছে। এরপর আসছে তথাকথিত তৃতীয় প্রজন্মের নিউক্লিয়ার চুল্লি – জলে ভাসমান ফ্লোটিলা। আগামী কয়েক বছরে ভারত এমন অনেক সন্দেহজনক বস্তু রাশিয়া থেকে কিনবে। আমরা মারী-মন্বন্তর নিয়ে ঘর করতে অভ্যস্ত – ভয় কি মরণে! **শু.মু.**

সাত

নিউক্লিয়ার কিস্সা

নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তি যত দক্ষ হচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই এই দুর্ঘটনার কারণ যতটা না প্রযুক্তির ব্যার্থতা, তার চেয়েও বেশি দায়ী মানুষের ভুল। রাসমিউসেন সাহেব এম আই টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালিয়ে "প্রমাণ" করেছিলেন যে, উড়োজাহাজে দুর্ঘটনা, ট্রেনে দুর্ঘটনার পরিমাণ এবং তার মোট সম্ভাবনা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে দুর্ঘটনার মোট সম্ভাবনার চেয়ে বেশি। বস্তুত সেই চর্বিত-চর্বণ থ্রি-মাইল আইল্যান্ড আর চের্নোবিল দুর্ঘটনা ছাড়া আমাদের মতো নিউক্লিয়ার শক্তির বিরোধী (ফলে কি উন্নয়ন – বিরোধী? মানুষদের ঝুলিতে আর কি-ই বা আছে? কিন্তু রাসামিউসেন সাহেবের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে উন্নত প্রযুক্তির দেশ জাপান-জার্মান-মার্কিন-ইংল্যান্ডে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা অব্যাহত। ভুবনায়নের ধাক্কায় বেসরকারীকরণের হিড়িক যত বাড়ছে, দুটো কিনলে একটা "ফ্রি" – এই হুজুগ যখন "এইডস্" রোগের মতো সর্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ করবে (তার সমস্ত সংকেত সুস্পষ্ট – তখন খরচ কমানোর উদগ্র তাড়নায় সমস্ত রকমের সুরক্ষা যে মা-গঙ্গার পূণ্য বক্ষে নিক্ষিপ্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

নভেম্বর ১৩, ২০০৮ – এ জাপানের বেসরকারী নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা – তোহোকু ইলেকট্রিক পাওয়ার কম্পানী অনেক টালবাহানার পর তাদের মিয়াগি

প্রিকেক্চার – এ ওনাগাওয়া নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটা ''সামান্য'' দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে! তাও তারা চেপে যেতো – কিন্তু এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (যথারীতি অস্থায়ী এবং চুক্তির ভিত্তিতে কর্মরত একজন শ্রমিক ভয়াবহ ভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। তখন জানা যায় যে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে অংশে নিউক্লিয়ার চুল্লির ''কোর'' অংশটি ছিলো, সেই বাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। আগুন যখন লাগে, তখন আগুন লাগার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নজরে আনার যন্ত্রটি বিকল ছিলো – গত কয়েকমাস যন্ত্রটি রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। এই বেচারা শ্রমিকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঐ ভবনটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগুন দেখতে পেয়ে সনাতনী পদ্ধতিতে, অর্থাৎ জল, বালি ইত্যাদি দিয়ে অক্সিজেনের যোগান কমানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে গিয়ে গুরুতরভাবে পুড়ে যায়।

ভয়ানকভাবে স্বয়ংক্রিয়, স্বনিয়ন্ত্রিত, ''অত্যাধুনিক প্রযুক্তি'' দ্বারা সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাটির অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাটি একেবারেই সাবেকী। আগুন লাগার খবর পৌঁছোতে লাগে ২০ মিনিট – আগুন নেভাতে লাগে ৫০ মিনিট! পরে কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে আগুন লাগার অন্যতম কারণ হলো, ওয়েল্ডিং যখন চলছিলো তখন আগুনের ফুলকির শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফিলটারের জন্য ব্যবহৃত শীতকে আগুন লাগে। লাগার কথা ছিলো না – কেননা শীতকে যাতে কোনো দাহ্য গ্যাস না ঢোকে তার জন্য ''অত্যাধুনিক'' প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। তবে কিনা যে ব্যক্তিটির এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে চলা ''ফ্লেমেবেল গ্যাস ডিটেকটর'' টি চালানর কথা এবং সেই অনুসারে বাকীদের সতর্ক করার কথা-তিনি পরব উপলক্ষ্যে ছুটিতে – ফলে এই বিপত্তি!

জাপানের তোহোকু-র এই ওনাগাওয়া নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি ইউনিট রয়েছে – তিনটি ইউনিট সম্মিলিত ভাবে ২১৭৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। যে ইউনিটটিতে আগুন লাগে সেটি ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে নিউক্লিয়ার জ্বালানী ভরার জন্য এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ ছিলো – কিন্তু অন্য দুটি ইউনিট চালু অবস্থাতেই ছিলো। আগুন নেভাতে আর ১৫ মিনিট বেশি সময় লাগলে চালু দ্বিতীয় ইউনিট-এ আগুন ছড়াতে পারতো।

জাপানে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিধ্বংসী দুর্ঘটনা প্রায় লাগাতার। টোকাইমুরা বা মিনাগা দুর্ঘটনা তীব্রতার দিক থেকে ভয়ানক। চের্নোবিলের পরও রাশিয়ার দুর্ঘনার কমতি নেই। বছরে এখনও গড়ে ১.৭ টি নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা ঘটে যেগুলো মারাত্মক থেকে অতিমারাত্মক দুর্ঘটনা হতে পারতো – কেবল আকস্মিকভাবেই তা ঘটেনি। পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের সংখ্যা যত বাড়বে – প্রতিযোগিতা যত বাড়বে, নজরদারী যত কমবে, ততই দুর্ঘটনা-প্রবণতা বাড়বে।

আমরা তো দেখলাম ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক পরমাণু চুক্তিতে আইএইএ নিউক্লিয়ার চুল্লির নজরদারীতে সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতকে ছাড় দিয়েছে – প্রায় একই রকমের ছাড় চীনও পেয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্থানসহ অন্যান্য দেশগুলোও পেতে পারে।

২০০৯ তাই নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে অশনিসংকেতবাহী। **শু. মু.**

আট

চীনের মেলামিন রহস্য

চীন দেশে অলিম্পিকের পর এখন শিশুমৃত্যু নিয়ে তোলপাড়। না, কোনো আকস্মিক মড়ক, সাম্রাজ্যবাদীদের কোনো জীবানু-যুদ্ধের বীজানু চীনের শিশুদের মৃত্যুর কারণ নয়। কারণ আরও গভীর – তাই তার আলোচনাও জরুরী।

আগষ্ট–সেপ্টেম্বর ২০০৮ থেকে দেখা যাচ্ছিল চীনের হাসপাতালগুলোতে অসুস্থ শিশুদের ভীড় – সংখ্যাটা চীন দেশের পক্ষেও ভয়াবহ। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এসে দেখা যায় যে একমাসেই ১৩,০০০ শিশু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি – অসুস্থ শিশুর সংখ্যা ততদিনে ৫৪,০০০ ছুঁই ছুঁই। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো যে এই শিশুরা, রাষ্ট্রের দ্বারা সার্টিফিকেট

প্রাপ্ত, শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চীনের বেসরকারীকরণের ঢেউ-এ ইন্দোনিশিয়ার একটি সংস্থা সারা দেশব্যাপী এই দুধ সরবরাহ করেছে। শিশুমৃত্যুর বিষয়টি চীনা সরকারের নজরে এসেছিল অলিম্পিক চলকালীন সময়ে, কিন্তু পাছে অলিম্পিকের জাঁক-জমকের বিঘ্ন ঘটে – এতজন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের কাছে বেইজ্জত হতে হয় – তারা বিলকুল নিঃশ্চুপ ছিলো এবং পরিহার্য মৃত্যুর মিছিল নিশ্চিন্তে বাড়তে দিয়েছে।

শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ এই ঘটনাটিই চীনের বর্তমান অভ্যন্তরীন শাসনব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা এবং কৃষ্টির মধ্যে যে কোনো একটা গোলমাল ঘটছে, কোনো এক ঘুনপোকা এই ব্যবস্থার গোড়া কাটতে শুরু করেছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে। শিশু মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়লো যে চীনেও দুধে ভেজাল রয়েছে এবং তা আমাদের ছোটোবেলায় পাটিগণিতের অংকের দুধে জল মেশানোর মত নিরামিষ ভেজাল নয়। এ এক আটঘাট বেঁধে, বৈজ্ঞানিকভাবে, গবেষণাপ্রসূত ভেজালের কারবার।

চীন দেশে দুধের ঘনত্ব এবং তাতে প্রোটিনের পরিমাণ মেপে শিশুখাদ্য হিসেবে সার্টিফিকেট দেওয়ার পদ্ধতি সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকে চলে আসছে – কমিউনগুলো এমন নজরদারি চালাতো সেই সময়। পরে বেসরকারীকরণের ধাক্কায় সেই সার্টিফিকেট প্রদানের পদ্ধতি বহুল পরিমানে কেন্দ্রীভবন ঘটে যায় – স্থানীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে হতে সেই নিয়ন্ত্রণ কমিউনস্তরের হাতের বাইরে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সার্টিফিকেট বাগাতে পারলেই তাই আধা-সরকারী, আধা-বেসরকারী, বেসরকারী এমনকি বিদেশী সংস্থাগুলো মহানন্দে ব্যবসা চালাতে পারে।

শিশুমৃত্যুর তদন্তে ধরা পড়েছে যে চীনে কৃত্রিমভাবে দুধের ঘনত্ব এবং তাতে প্রোটিনের পরিমাণ কৃত্রিমভাবে সরেস দুধের মতো দেখানোর জন্য মেলামিন নামক একটি প্লাস্টিক জাতীয় যৌগ ভেজাল হিসেবে মেশানো হয়। মেলামিনে নাইট্রোজেন রয়েছে প্রচুর – এবং এখন পর্যন্ত, প্রোটিনের পরিমাণ নির্ধারণে দুধে নাইট্রোজেনের উপস্থিতিরই পরিমাপ করা হয়! এই মেলামিন প্রাণীদের জন্য কোনো খাদ্যবস্তু নয় – প্রাণী মেলামিন হজম করতে পারেনা; এই মেলামিন মানুষের কিডনীতে জমতে থাকে এবং কিডনী সংক্রান্ত অসুখে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অবধারিত। এই মেলামিন আকস্মিকভাবে দুধে মেশার কোন সম্ভাবনা নেই – দুধ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির কোনো স্তরেই মেলামিন মিশে যাওয়ার কোনো কারণই নেই। যে পরিমাণ মেলামিন এই সমস্ত ভেজাল দুধগুলো থেকে পাওয়া গেছে তা থেকেও বোঝা যাচ্ছে তা প্রাকৃতিকভাবে অশুদ্ধতার কারণে যতটা মিশতে পারে বলে অনুমান করা সম্ভব তার কয়েকশো গুণ। অর্থাৎ ভেজাল হিসেবে ব্যবহারের অভিপ্রায়েই মেলামিন কে দুধে মেশানো হয়েছিল।

মজার বিষয় হলো তেংসিয়াও পিং মহাশয় যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইঁদুর ধরার দৌড়ে রং না দেখেই বেড়াল ধরার নিদান দিচ্ছিলেন তখন থেকেই এই সমস্ত আজব কান্ডকারখানা চীনে শুরু হয়েছে। চীনের শিল্প উৎপাদনের এমন রমরমা সময়েও এই মেলামিন নামক বস্তুটির প্রায় কোনো শিল্প চাহিদা নেই – অথচ ১৯৮০ সাল থেকেই চীন এককভাবে সারা এশিয়ায় সর্ববৃহৎ মেলামিন আমদানি করে চলেছে। ভেজাল দেওয়ার তাগিদ ছাড়া এমন বেহিসেবী আমদানির কোনো ব্যাখ্যা নেই। ভেজাল-আক্রান্ত শিশুদের ২০০ জন মৃত, ৩০,০০০ জন স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

''সানলু'' নামে ইন্দোনেশিয়ায় পঞ্জীকৃত যে বেসরকারী সংস্থাটি এই দুধ সরবরাহ করেছে – সেই সংস্থাটি কবুল করেছে যে তারা জানতো যে তারা দুধে মেলামিন মেশাচ্ছে এবং এই মেলামিন মিশ্রিত দুধ, যা দুধের গুণবিচার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বাজারে চালান করছে, তা খেলে বাচ্চারা শেষ পর্যন্ত কিডনীর রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

চীনের মতো একটা গণপ্রজাতন্ত্রে যখন এমন এক ঘটনা ঘটে তখন বুঝতে হবে ব্যবস্থার মধ্যে ভূত ঢুকেছে – সেই ভূত তাড়ানোর আশু নিদান প্রয়োজন। এই ভেজালের বিষয়টি একটিমাত্র ঘটনা এমন নয় – আড়াই দশক ধরে চীনে এমন

নানান কান্ড ঘটে চলেছে। চীনে প্রস্তুত বাচ্চাদের খেলনা তৈরির মালপত্রে দেখা গেছে আসলে শিল্প বা শহরের বর্জ্য পদার্থ - তাতে ভরা ধাতু, এমনকি রাসায়নিক বিষও পাওয়া গেছে। কানাডাসহ পৃথিবীর অনেক দেশ চীনের খেলনা নিষিদ্ধ করেছে। মার্কিন দেশ ও জার্মানী চীনের টমেটোতে বিষ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে চীনের আম-জনতা এখনও এই সমস্ত দ্রব্যগুলো ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। চীনের বিশেষ আর্থিক অঞ্চলের সুতীব্র শোষণ ইত্যাদির কাহিনী সুপরিচিত। চীনের টর্চ, ব্যাটারী, ইত্যাদি সৌখিন দ্রব্যাদি কিনবার সময় একবার ভেবে নেবেন বাড়িতে প্রসব ''টাইম বম্ব'' পুষবেন কিনা! **শু. মু.**

নয়

গণপ্রতিবাদে চিন সরকার পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার পরিকল্পনা বাতিল করল

চিনের ফুজিয়ান (Fujian এর অন্তর্গত জিয়ামেন (Xiamen শহরে ২০০৭ এর জুন মাসে দশ হাজারেরও বেশী মানুষ গণ-পদযাত্রায় (Collective walk অংশ নেন। তাঁদের দাবী জিয়ামেনে পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা স্থাপন করা চলবে না, কারণ এটা নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক এবং বন্দর শহরটার সৌন্দর্য নষ্ট করবে। শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষরাই ছিলেন এই পদযাত্রার উদ্যোক্তা এবং অংশীদার। এবং মোবাইল ফোন এস এম এস এবং ই-মেলের মাধ্যমেই তাঁরা সহ নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এই পদযাত্রার আয়োজন করেন। পদযাত্রা হয় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিরুত্তাপভাবে। এবং কি আশ্চর্য, সরকার পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার নির্মাণকাজ বন্ধ রেখে, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব পর্যালোচনার আদেশ দেন। নাগরিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি গণশুনানিরও আয়োজন হয় এবং অবশেষে ২০০৭ এর ডিসেম্বরে নাগরিকদের যুক্তি ও মত গ্রহণ করে দেড়শো কোটি ডলারের প্রকল্পটি প্রত্যাহার করে নেন।

এই ঘটনায় চিনে এবং চিনের বাইরে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে। কেননা, সাম্প্রতিককালে শিল্পাদির জন্য জমি অধিগ্রহণ বা বস্তি উচ্ছেদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কঠোর দমন-পীড়ন চালিয়ে কাজ হাসিল করাই চিনা দস্তুর হয়ে উঠেছিল। শিল্প বা অন্য যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মানুষদের সম্যক অবহিত করারও প্রয়োজন বোধ করত না সরকার। অথচ জিয়ামেন এর শহরে নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকারের দাবী সরকার কেন উপেক্ষা করতে পারল না তা নিয়ে একরকম গবেষণাই শুরু হয়ে গেছে।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চাইনিজ স্টাডিজ এর প্রধান অধ্যাপক রিচার্ড বাউম-এর মতে এই তথ্য - বিপ্লবের যুগে সরকারের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠোর হাতে বিক্ষোভ দমন আর সম্ভব হচ্ছে না। এতে চতুর্দিকে সোরগোল ওঠার প্রভুত সম্ভাবনা, বিশেষ করে যদি শহরে শিক্ষিত মানুষরা এতে জড়িত থাকেন। কেননা তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক প্রকরণ তাঁদের করায়ত্ব।

অধ্যাপক বাউমকে অস্বীকার না করেও বোধহয় বলা যায় যে সমালোচনা বা বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভবনা চিন সরকারকে যতটা না বিচলিত করেছে, তার চেয়েও বেশী কাজ করেছে সাম্প্রতিক অতীতে পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা এবং তার থেকে সৃষ্ট মারাত্মক দূষণ।

২০০৫-এর ডিসেম্বরে জিলিন শহরের কাছে পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রায় একশো টন বেনজিন ও নাইট্রোবেনজিন জিলিন নদীতে গিয়ে পড়ে। প্রথমে ঘটনাটি চেপে যাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পানীয় জলের আকাল সৃষ্টি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করা হয়। জিলিন নদীর জলকে শোধন করেই শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হতো, সেটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নদীর উপরে আশি কিলোমিটার একটি সর-বেনজিন ও নাইট্রোবেনজিন সমৃদ্ধ - ভাসতে থাকে এবং স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। পথে হার্বিন (Harbin এবং হাইলংজিয়াং (Heilonjiang এর মত বড় শহরও পানীয় জলের সংকটে পড়ে যায়। কারণ ঐ শহরগুলিতেও পানীয় জলের ব্যবস্থা

জিলিন নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। প্রায় একমাস ধরে নদীর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে এগোতে থাকে বিশাক্ত রাসায়নিকের ঐ সর। শেষে আমুদারিয়া পেরিয়ে রাশিয়ার সীমান্ত শহরে পৌঁছায়, অতিক্রম করে প্রায় পনেরশো কিলোমিটার পথ। তখনও জলে বেনজিন - নাইট্রোবেনজিনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী। দুদেশের মধ্যে শুরু হয় টানাপোড়েন। চিন রাশিয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। চিনা মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। চিনের পরিবেশ সুরক্ষা এজেন্সী শেষে দোষ স্বীকার করে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজেই, মনে হয়, জিলিনের এই দুর্ঘটনা ও দূষণের দগদগে ঘা - চিন সরকারকে অনেকটাই বাধ্য করেছে জিয়ামেন-এর নাগরিকদের কথা শুনতে। আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারও কি চিনের এইসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপ নেবেন, নাকি মানুষকে মেরে বিপদগ্রস্ত করে তবেই তাঁদের বোধোদয় হবে! (তথ্যসূত্র ঃ The Statesman, ফেব্রুয়ারী ১, ২০০৮ এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট **র. ম.** দশ

মিডিয়ার অন্দরমহল

আজকের দিনে মানুষের ভাবনা চিন্তার অনেকটাই কন্ট্রোল করে মিডিয়া। প্রিন্ট এবং টিভি উভয় মিডিয়াই। মিডিয়া মাত্রেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানা। কারা এই মালিক বা গোষ্ঠী জানতে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠিকঠাক খবর জানা শক্ত। এই নিয়ে নানান প্রচার আছে। সত্য মিথ্যে জানা নেই। বাজারে উড়ে বেড়ানো কয়েকটা খবর দেওয়া যায়। যেমন, টাইমস নাউ হল টাইমস গ্রুপের চ্যানেল। মালিক বেনেট অ্যান্ড কোলম্যান। ওয়ার্লড ক্রিস্টিয়ান কাউন্সিলের মেজর শেয়ার রয়েছে এতে। কুড়ি শতাংশ শেয়ার আছে একজন ইংরেজ ও একজন ইটালিয়ানের। ইটালিয়ান ভদ্রলোক হলেন রাবার্টিও মিন্ডো। ইনি শোনা যায় শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীর কেমন আত্মীয়। সিএনএন-আইবিএন হল মার্কিন যুক্তরাজ্যের সাউদার্ন ব্যাপটিস্ট চার্চের চ্যানেল। এর প্রধান হলেন রাজদীপ সরদেশাই। এনডি টিভি হল স্পেনের গসপেল অফ চ্যারিটিজের চ্যানেল। এরা নাকি আবার কমিউনিস্ট আদর্শে আস্থাশীলী! এদের চ্যানেলের প্রধান হলেন সিপিএম পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রকাশ কারাতের শ্যালক শ্রী প্রণয় রায়। শোনা যায় এনডি টিভি-গোষ্ঠী সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডে সাপ্তাহিক কাগজটি কিনে নিয়েছে। যেটা বিজেপি ঘেঁষা কাগজ বলে লোকে বলতো। স্টার টিভি'র মালিক হলেন অস্ট্রেলিয়ার একজন। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে হিন্দুস্থান টাইমস হল বিড়লা গ্রুপের। 'দি হিন্দু' হল সুইস জেসুয়া সোসাইটির। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস হল ক্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রির। এশিয়ান এজ হল সৌদি আরবের এক ব্যবসায়ীর।

মুম্বাই কান্ডের পর টিভি চ্যানেলগুলোকে দেখা গেল রাজনৈতিক নেতাদের মুন্ডুপাত করতে লেগেছে। যেন হঠাৎ এদের কথা মনে পড়ে গেছে। অথচ এমনি সময় দেখা যায় এরাই ওই রাজনৈতিক নেতাদের ছবি জনমনে গেঁথে দেবার জন্য অবিরাম তাদের খবর প্রচার করে চলেছে। যাদের মধ্যে অনেক দাগী আসামীও আছে। দাগী বলেই হয়তো খবর হচ্ছে তারা। কিন্তু এই সুযোগে তার প্রচারটাও হয়ে যাচ্ছে। কারণ সব দাগী রাজনৈতিক নেতাদেরই একটাই অজুহাত যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি তিনি নিরপরাধ। তা সে খুন-জোচ্চুরি যে মামলাতেই আসামী হোন তিনি। আর সবাই জানে আমাদের দেশে পয়সা খরচ করতে পারলে মামলা সারা জীবন ঝুলিয়ে রাখা শক্ত নয়। মিডিয়া চাইলেই এই ধরনের রাজনৈতিক নেতাদের বর্জন করতে পারে। কিন্তু করে না, বা করা যায় না। কেন করা যায় না সে রহস্য বোঝার জন্য শার্লক হোমস হবার দরকার হয় না।

আসলে ব্যবসা আর রাজনীতি সব একাকার এখন। **র.চ.**
এগার

কে কয় আমাগো ভারত গরীব

বিশিষ্ট চোরেরা চুরির টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা করে সবাই জানে। শুধু ভারত নয়, সব দেশের চোরেরাই তাই করে। এরা এলেবেলে চোর না। স্ব স্ব দেশে বিশিষ্ট ব্যক্তি এরা। কেউ নেতা, মন্ত্রী বা তাদের আপনজন। কেউ সরকারি আমলা বা তাদের আশ্রয়পুষ্ট এজেন্ট। কেউ ফিল্ম-স্টার কিংবা তাদের মেনটর ডন। কেউ ব্যবসাদার কিংবা দেশ-গৌরব ইনডাস্ট্রিয়ালিষ্ট। এনারা চারদিক আলোকিত করে ঘুরে বেড়ান দেশে এবং বিদেশে। এদের অনেকেরই ছবি ও মুখ নি:সৃত বাণী টিভি মারফৎ প্রচারিত হয়। আমরা শুনি এবং দেখি।

ভারতের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ গৌরবের অধিকারী আজ। চুরির টাকা জমাকারী হিসেবে পৃথিবীর সব দেশকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছে এরা। সুইস ব্যাঙ্কে এদের জমানো অর্থের পরিমাণ অকল্পনীয় স্তরে পৌঁছেছে। ডলারের হিসেবে তার পরিমাণ ১,৪৫৬,০০০,০০০,০০০ ডলার!! লক্ষ-কোটির চেনা অঙ্কে বলতে গেলে ১.৪৫৬ লক্ষ কোটি ডলার! এর পরেই দৌড়ে অনেক পেছিয়ে রয়েছে রাশিয়া। -জমার অঙ্ক মাত্র এর তিন ভাগের এক ভাগ।

ভারতীয় চোরেদের জমানো টাকার অঙ্কটা কত বড় বোঝানর জন্য কিছু উপমা দিতে হয়। ধরা যাক এই টাকাটা আমাদের দেশের গরীব মানুষদের মধ্যে বিলি করার বন্দোবস্ত করা হল। তাদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে ঠিক হল। তাহলেও ৪৫ কোটি লোককে দেওয়া যাবে এই টাকা! আরেকটি দৃষ্টান্ত। আমারা আমাদের বিদেশি ঋণের বোঝা নিয়ে অনেক দুর্ভাবনার কথা বলি। কিন্তু এই টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে এক লহমায় সব ঋণ শোধ করে ফেলা যায়। সুইস ব্যাঙ্কের ভারতীয়দের জমানো টাকাটা আমাদের মোট বিদেশী ঋণের পরিমাণের ১৩ গুণ। অর্থাৎ এই টাকাটা ফিরিয়ে আনতে পারলে সমস্ত বিদেশী ঋণ শোধ করার পরেও ঋণের বারো গুণ টাকা হাতে থাকবে। সেই টাকাটা যদি ব্যাঙ্কে ফেলে রাখা যায় তার সুদের পরিমাণ হবে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় বাজেট অঙ্কের থেকে বেশি! শুধু সুদের পরিমাণই এই। তাহলে টাকার পরিমাণটা কেমন, ভাবুন! এই টাকা যারা আত্মসাৎ করছে তারা দু'ভাবে দেশের সর্বনাশ করছে। চুরি করে এক দফায় করেছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করে আরেক দফা। এদেশের টাকায় বিদেশের পুষ্টি হচ্ছে।

এদেশ থেকে সুইজারল্যান্ডে যাতায়াতকারী লোকের সংখ্যা বছরে ৮০ হাজার। এর মধ্যে ঘন ঘন যাতায়াতকারীর সংখ্যা হল ২৫ হাজার! এদেরই এক অংশের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করতে হাজার হাজার চাষীর জমি কেড়ে নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে এরোপোলিস স্থাপনের প্রতিযোগিতা চলছে। সেই পোলিসের একটি এই রাজ্যেও বসতে চলেছে। এত ঘন ঘন সুইস দেশে যাতায়াত করেন যারা তারা নিশ্চয়ই নিছক হাওয়া বদল করতে কিংবা সাইট-সিইং করতে যান না? ভারত সরকার চাইলেই সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম-ধাম ঠিকুজি-কুষ্ঠী উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু করে না। কি করে করবে? 'ভারত সরকার' মানে কারা? কারা আবার, সেই 'বিশিষ্টজনদেরই' কেউ কেউ তো। নয় কি?

র.চ.